বাংলাদেশঃ একটি গ্রামীণ এবং কৃষি নির্ভর দেশে কৃষি ও ভূমি সংস্কারের গুরুত্ব

Posted on June 19, 2025 by Communist party of Bangladesh (Marxist-Leninist)

গত ২৯ মে ২০২৫ বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের আয়োজনে জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে কৃষি ও ভূমি সংস্কার বিষয়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি কমরেড বদরুল আলমের সভাপতিত্বে সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি সাবেক তত্বাবধায়ক সরকারের বাণিজ্য ও শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান ও পিপিআরসি-র নির্বাহী চেয়ারম্যান, সম্মানীয় অতিথি , ড.এম এ সোবহান, উবিনিগের উপদেষ্টা ও বিশিষ্ট উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, জাহাঙ্গীর হোসেন জনি, উবিনিগের ডাইরেক্টর, বিকাশ বিশ্বাস, ম্যানেজার, কারিতাস বাংলাদেশ, ডা: শাসুন্নাহার খান ডলি, সভাপতি, বাংলাদেশ কিষাণী সভা, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জায়েদ ইকবাল খান, বাম ঐক্য জোটের নেতা, সমাজতান্ত্রিক মজদুর পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতির সহ-সভাপতি ডা: শামসুল আলম, সমন্বিত শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি মো: নাহিদ হাসান নয়ন, মাদারল্যান্ড গার্মেন্টস শ্রমিক

ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মো: আলামিন হোসেন, কৃষক নেতা আলম বাচ্চু, ফজলু মুন্সী, হাসিনুর, মোঃ গাফ্ফার, সঞ্জীব সিং, প্রমূখ।

সভায় মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন বিশিষ্ট গবেষক আহমেদ বোরহান। প্রবন্ধ পাঠের পর মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। মুক্ত আলোচনায় উপস্থিত সদস্যরা অংশগ্রহণ করে।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে ড. হোসেন জিল্লুর রহমান তাঁর বক্তব্যে বলেন, কৃষি দেশের অর্থনীতির বড় শরীক অথচ দেশের বৃহত্তর খাত কৃষি নিয়ে সরকারের পরিকল্পনা স্পষ্ট নয়। আগষ্ট অভ্যূথানের প্রেক্ষাপটে কৃষি সংস্কার কমিশন গঠন করলে তা যুক্তিযুক্ত হত। ভূমি ও কৃষি সংস্কার এখন সময়ের দাবী–ফরজ কাজ। তিনি দরিদ্র মানুষের দাবী আদায়ের লড়াইয়েকে শক্তিশালী করা একটি পবিত্র কাজ মনে করেন। ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীনের অনিষ্টকারী কায়েমি স্বার্থবাদী মহলের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি দেশের কৃষকের উন্নয়ন করাকে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিতার সামিল মনে করে।

ড: এম এ সোবাহান তাঁর বক্তব্যে বলেন, কৃষি সংস্কার অত্যন্ত জরুরী। আমাদের রাসায়নিক সার ও কিটনাশক নির্ভর চাষাবাদ হতে বেরিয়ে আসতে হবে। প্রাকৃতিক, পরিবেশ ও প্রতিবেশ নির্ভর চাষাবাদ ব্যাপকভাবে চালু করতে হবে। উবিনিগের পরিচালক জাহাঙ্গীর হোসেন জনি বলেন, কৃষিক্ষেত্রে বহুজাতিক কোম্পানীর দাপট বন্ধ করতে হবে।
কারিতাস বাংলাদেশের ম্যানেজার বিকাশ বিশ্বাস বলেন ধরিত্রী বাঁচাতে আশাকে জাগ্রত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কৃষকের ভূমিকা কেন্দ্রীয়।

বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি কমরেড বদরুল আলম বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য তথা ক্ষুধা ও দারিদ্র নিরসনে একটি সমন্বিত কৃষি ও ভূমি সংস্কার আজকের বাস্তবতায় জরুরী কর্তব্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায় বন্টনমূলক কৃষি ও ভূমিসংস্কারের উপর জোর

প্রদান করেন।
কৃষি ও ভূমি সংস্কার প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে কৃষক, আ্যগ্রোইকোলজী ও খাদ্যসার্বভৌত্বের ধারনার স্থান থাকতে হবে। তিনি বলেন সংস্কারের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক জলবায়ুর প্রভাবকে বিশেষ বিবেচনায় রাখতে হবে।

সম্মেলনে নিম্নোক্ত সুপারিশ সমূহ উপস্থাপন করা হয়:

১. প্রকৃত ভূমিহীনের মাঝে খাসজমি বিতরণ করা
২. সমন্বিত ভূমি ও কৃষি সংস্কার করা
৩. দেশের সমস্ত খাসজমি চিহ্নিত করা
৪. খাসজমির অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করা
৫. খাসজমির অবৈধ দখলদারদের বিচারের আওতায় আনা
৬. খাদ্যসার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা
৭. জলবায়ু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনও ক্ষতিপূরণ দেয়া
৮. সবুজ জলবায়ু তহবীল প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের স্বার্থে ব্যয়করা
৯. কৃষিজমিকে অকৃষি জমিতে রূপান্তর বন্ধ করা
১০. অনুপস্থিত ভূমি মালিকানা বাতিল করা
১১. ভেস্টেড প্রোপার্টি আইন বাতিল করে প্রকৃত মালিকের হাতে ভূমি হস্তান্তর করা
১২. পতিত সম্পত্তির নামে হিন্দুর সম্পত্তি দখল বন্ধ করা

মূল প্রবন্ধ : একটি গ্রামীণ এবং কৃষি নির্ভর দেশে কৃষি ও ভূমি সংস্কারের গুরুত্ব

নগরায়ন ও শিল্পায়নের কারণে স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে গ্রামীণ জনসংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে। তবে সর্বশেষ আদমশুমারি ২০২২ অনুসারে দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৬৯ শতাংশ মানুষ এখনও গ্রামে বসবাস করে। এই থেকে এটি

প্রতীয়মান হয় যে নগরায়ণ, শিল্পায়ন এবং অর্থনীতিতে পরিষেবা খাতের আধিপত্যের মধ্যেও বাংলাদেশ এখনও মূলত একটি গ্রামীণ এবং কৃষির উপর নির্ভরশীল দেশ। গ্রামীণ অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর বড় অংশই সরাসরি কৃষির সাথে সংযুক্ত। শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৩ অনুসারে দেশের মোট কর্মশক্তির ৪৫.১ শতাংশ কৃষিতে নিয়োজিত রয়েছে। কৃষি একদিকে যেমন লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকার অবলম্বন তেমনি অন্য দিকে তা দেশের খাদ্য ও পুষ্টির প্রধান যোগানদাতা ।

৫ই আগস্টের ছাত্র ও জনতার অভ্যুত্থানের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থার কাঠামো রূপান্তর, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী, জবাবদিহিমূলক ও জনবান্ধব করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ খাতের সংস্কারকে (সাংবিধানিক , নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ, পুলিশ, জনস্বাস্থ্য , দুর্নীতি দমন, নারী, শ্রম ইত্যাদি) বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। এই লক্ষে সরকার সম্পর্কিত ক্ষেত্রে সংস্কার কমিশন গঠন করেছে । আমরা এই স্ব স্ব ক্ষেত্রে এই সংস্কার কমিশনের সাফল্য কামনা করি। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের মতো কৃষিনির্ভর দেশে কৃষি ও ভূমি সংস্কার প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য খাতের সংস্কারের পাশাপাশি কৃষি ও ভূমি সংস্কার না করা হয়, তাহলে এটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, এবং সম্পূর্ণ হবে না। তাই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি আমাদের আহবান থাকবে একটি জনবান্ধব এবং সমন্বিত কৃষি ও ভূমি সংস্কারের জন্য একটি কমিশন গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

ভূমি সংস্কারের ধারণা এবং প্রাসঙ্গিকীকরণ

ভূমি সংস্কার বলতে বোঝায় সাধারণত বৃহৎ জমির মালিকের কাছ থেকে অল্প বা

কোন জমি নেই এমন ব্যক্তির বা পরিবারের মধ্যে জমি পুনর্বণ্টনের লক্ষ্যে জমির মালিকানা, ভূমি ব্যবহার এবং ভূমি হস্তান্তর সম্পর্কিত আইন, বিধির পরিবর্তন । ভূমি সংস্কারের মধ্যে কৃষি জমির পুনর্বণ্টন, ভূমি মালিকানা ব্যবস্থায় পরিবর্তন এবং জমির মালিকানা সীমিত করার জন্য সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ অন্তর্ভুক্ত।

জমি বণ্টনের সাথে সম্পর্কিত সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে এতে সরকার কর্তৃক সম্পদের অধিকারের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হয়। ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ এবং সর্বশেষ ভূমি সংস্কার বিল-২০২৩ যথাক্রমে বসতবাড়ির জমির জন্য অতিরিক্ত সুরক্ষা ও বসতবাড়ির জন্য খাস জমি বণ্টন এবং, জমির সর্বোচ্চ নতুন সীমা (৬০ বিঘা) নির্ধারণ করা হয়েছে। ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশে আবাসিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বসতবাড়ির জমির জন্য অতিরিক্ত সুরক্ষার বিধান রাখা হয়েছে । এর ধারা ৬ এর অধীনে এই সম্পত্তিগুলিকে উচ্ছেদ থেকে রক্ষা করে। ১৯৮৪ সালের অধ্যাদেশের ৭ ধারায় সরকারকে বসতবাড়ির জন্য খাস জমি (রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন) বরাদ্দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে শ্রমিক এবং কৃষকদের জন্য, প্রতি ব্যক্তির জন্য সর্বোচ্চ পাঁচ কাঠা। এই বরাদ্দকৃত জমির মালিকানা নিশ্চিতভাবে সুবিধাভোগী পরিবারের মধ্যে থাকবে। উত্তরাধিকারসূত্রে পরবর্তী প্রজন্ম ভোগ/ব্যবহার করতে পারবে তবে তা হস্তান্তরযোগ্য নয়। ভূমি সংস্কার বিল ২০২৩-এ প্রতি ব্যক্তির জন্য ৬০ বিঘা জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, যেখানে রাষ্ট্র অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণ করবে। সমবায় সমিতি এবং কিছু কৃষি-শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য ছাড় রয়েছে।

ভূমির মালিকনা বা প্রাপ্যতা ব্যক্তি বা পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। ভূমি এবং প্রাকৃতিক সম্পদে মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ কিছু ব্যক্তির কাছে কুক্ষিগত থাকলে সমাজে বৈষম্য ও অসমতা প্রবল হয়ে উঠে । ভূমির অপ্রাপ্যতা হল দারিদ্র্যের অন্যতম মৌলিক নির্ধারক এবং ভূমি পুনর্বণ্টন দারিদ্র্যের

বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী অস্ত্র। কিন্তু এ দেশে ৮০% জমির মালিকানা মোট জনসংখ্যার মাত্র ২০% ব্যক্তির কাছে যার বেশিরভাগই আমলা, রাজনীতিবিদ, সামাজিক অভিজাত এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সরকার খাস জমি বন্টনকে অগ্রাধিকার দিয়ে চলেছে, তবে এর অগ্রগতি ধীর। এবং অমীমাংসিত ভূমি বিরোধ, ভূমি গ্রাস বা দখল ও ভূমি সম্পদের অপর্যাপ্ত তথ্য উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ হিসাবে রয়ে গেছে । অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র রাজনৈতিক কাঠামোর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এক গবেষণায় দেখা গেছে রাজনৈতিক মদতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দখলদাররা ২৬ লক্ষ একর দখল করে আছে। ভূমি দস্যুরা আমলাদের একাংশের সহায়তায় খাস জমিসহ অন্যান্য জমি দখল করে রাখে। যদিও পুনর্বণ্টনমূলক ভূমি সংস্কারের চেতনাটিই সবচেয়ে শক্তিশালী কারন তা শুধু অর্থনৈতিক নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক বঞ্চনাকেও দূর করতে পারে তবে তা বাস্তবায়ন করাও কঠিন। প্রতিবাদের শক্তিশালী ভাষা ও কর্মসূচী প্রয়োজন একে মোকাবেলা করার জন্য।

বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন ও কৃষাণী সভা- ভূমিহীন কৃষকদের জমির অধিকার প্রাপ্তির সংগ্রামে নিরন্তর সাথী বামপন্থী অবিসংবাদী কৃষক নেতা আবদুস সাত্তার খান একটি শক্তিশালী কৃষক সংগঠন গড়ার জন্য দশমিনা ও পটুয়াখালী অঞ্চলের কৃষক সংগঠকদের নিয়ে প্রথমত উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৭৬ সালে কৃষক নেতা আবদুস সাত্তার খানের নেতৃত্বে ‘বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন’ কৃষক সংগঠন হিসাবে এর যাত্রা শুরু করে। যাত্রা শুরুর ৩ বছর পরে ‘বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন’ ১৯৭৯ সালে দশমিনা ও পটুয়াখালী অঞ্চলের কৃষক সংগঠকদের নিয়ে পটুয়াখালীর দশমিনায় তিনদিন ব্যাপী প্রথম জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করে যেখানে সারা দেশ থেকে ৫০০০ কৃষক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে এই সম্মেলন একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের ধারাবাহিকতায় কৃষক নেতা আবদুস সাত্তার খানের অনুপ্রেরণায় ১৯৯০ সালে পটুয়াখালী অঞ্চলের কিষাণীদের সম্পৃক্ত করে কিষাণীদের জন্য সংগঠন ‘ বাংলাদেশ কিষাণী সভা’ গঠিত হয়।

বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন ও কিষাণী সভা ভূমিহীন কৃষকদের জমির অধিকারের সংগ্রামকে সবচেয়ে গুরুত্ব দেয়। ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে কৃষক ফেডারেশনের দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ; দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ২৫০০০ প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করে। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ১৯৮০ সালের অক্টোবর মাসে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে খাস জমি বণ্টনের দাবিতে শুরু হয় নতুন কর্মসূচি লং মার্চ; এতে ১০০০০ ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক অংশগ্রহণ করে। ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে কৃষক ফেডারেশনের নেতৃত্বে প্রথম ভূমিহীন কৃষকরা চর বোরহান , চর শাহাজালাল, চর হাদি, চর বাশবাড়িয়া দখল করে ; ভূমিহীনরা মোট ২২০০০ একর খাস জমি দখল করে। তবে পুলিশ বাহিনী সদসরা কয়েকটি চরের কৃষকদের ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে দেয়, ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে এবং কৃষক ফেডারেশনের নেতা সাত্তার খানকে প্রথমে গ্রেপ্তার হলেও পরে উচ্চ আদালতের আদেশে মুক্তি পান। কৃষকরা কোন কারনে চরে অনুপুস্থিত থাকলে রাজনৈতিক দলগুলির মদতে ভুমিদস্যুরা কৃষকদের ঘর-বাড়ি, ক্ষেতের ফসল নদীতে জোয়ারের সময় ভাসিয়ে দেয়। এ সমস্যা সমাধানে কৃষক ফেডারেশন পটুয়াখালী অঞ্চলে চার হাজারের বেশী ভূমিহীন পরিবারকে (পুরুষ ও নারী সদস্য) ঐক্যবদ্ধ করে সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ দেন । অতপর ১৯৯২ সালের গোড়ার দিকে দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামের পর মোট ৩০,০০০ ভুমিহীন নারি-পুরুষ পুনরায় ৪টি চর দখল করে আজও সেখানে অবস্থান করছে। খাস জমি দখল-অবস্থানের এ সংগ্রাম আজও চলমান ও আইনি প্রক্রিয়া বজায় রেখে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের নেতৃত্বে ৭৬৬০০ একর খাস ও পতিত জমি দখল ও বণ্টন করা হয়েছে। এর প্রায় এক তৃতীয়াংশ জমিতে চীরস্থায়ীভাবে সরকারী বন্দোবস্থ পেয়েছে। এর পাশাপাশি, দেশের উত্তরাঞ্চলের কুড়িগ্রাম সীমান্ত উপজেলা ভুরুঙ্গামারীতে ব্রিটিশ আমলের পতিত ১২.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলওয়ের সম্পত্তি ২০০৪ সালে সংগঠনের নেতৃত্বে দখল করে প্রায় আড়াই হাজার ভূমিহীন নারী-পুরুষ বসবাস করে আসছে। ভূমির এই দীর্ঘ আন্দোলন ও সংগ্রামে ভূমিহীনদের অধিকার আদায়ে বাংলাদেশ কিষাণী সভার সদস্য জায়েদার জীবন দিতে হয়েছে। সাতক্ষীরার দেবহাটা- কালিগঞ্জে ৯টি চিংড়ি ঘের ১৯৯৮ সালে সংগঠনের নেতৃত্বে এলাকার অবৈধ দখলদার প্রভাবশালীদের উচ্ছেদ করে ভূমিহীনদের দখলে নেয়া হয়। এ দখল

আন্দোলনে বাংলাদেশ কিষাণী সভার সদস্য জায়েদা পুলিশের অতর্কিত গুলিতে নিহত হয়। পরবর্তিতে এলাকার নামকরণ জায়েদা নগরী করা হয়।

দেশে ভূমিহীনতার চিত্র

কৃষি ও কৃষক উভয়ের ক্ষেত্রেই ভূমিতে প্রবেশাধিকার ও মালিকানার বিষয়টি জটিল। বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশের জীবিকার প্রধান উৎস হল জমি, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় যেখানে কৃষিই প্রধান পেশা। তাই কৃষিখাতে ও গ্রামীণ জীবনে ভূমির অধিকার ও মালিকানার প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । স্বাধীনতার পর থেকে দেশে ভূমিহীনের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ষষ্ঠ কৃষিশুমারি ২০১৯ থেকে জানা যায় দেশে ১১.৩৩ শতাংশ পরিবার অর্থাৎ দেশের ৩,৫৫,৩০০০০ পরিবারের মধ্যে ৪০,২৫৫৪৯ পরিবার সম্পূর্ণরূপে ভূমিহীন যেখানে গ্রামীণ অঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলের ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশী। অন্যদিকে বাংলাদেশ ল্যান্ড স্ট্যাটাস রিপোর্ট ২০১৫ অনুসারে ১৯৬০ থেকে ২০০৬ এর মধ্যে ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৬ শতাংশ হয়েছে। প্রতি বছরই ভূমিহীনতার সাথে সাথে খামারের গড় আয়তন কমছে, খামারের গড় আয়তন ০.৬ হেক্টরেরও কমে গেছে এবং ভূমিহীনতা জনসংখ্যার ৫৮ শতাংশকে প্রভাবিত করে, যা অবশিষ্ট আবাদযোগ্য জমির উপর ক্রমবর্ধমান চাপের প্রতিফলন ।

ভূমি এবং এর মালিকানা কেন এতো গুরুত্বপূর্ণ

ভূমি অনাদিকাল থেকেই সামাজিক মর্যাদা, রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাব এবং শ্রেণী কাঠামো নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান নির্ধারক। সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস, এবং ক্ষমতা কাঠামো গঠনে বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজে ভূমির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । এক টুকরো জমির মালিকানাই একজন ব্যক্তিকে একটি দেশে তার নাগরিকত্বের তাৎক্ষণিক এবং বাস্তবিক অনুভূতি প্রদান করে।

উন্নয়নশীল বিশ্বের গ্রামগুলিতে যেখানে সমগ্র সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন ভূমির উপর নির্ভরশীল, সেখানে ভূমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে একটি বড় সংখক জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রাথমিক উৎস কৃষি তাই ভূমির মালিকানার ধরণ শুধুমাত্র জনসাধারণের উপযুক্ত জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রেই নয়, বরং তাদের সাধারণ কল্যাণ, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সমতার ক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভূমির মালিকানা এবং এর সাথে সম্পৃক্ত উৎপাদন সম্পর্ক শুধু খাদ্য-নিরাপত্তা এবং জীবিকা নির্বাহের প্রশ্নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং নিশ্চিত ভাবেই সবচেয়ে মৌলিক মানবিক চাহিদা হচ্ছে তার শারীরিক অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা।

ভূমির মালিকানার আইনগত দিক এবং এই সংক্রান্ত বিরোধ

পরিবার প্রতি কৃষি জমির মালিকানার সীমা পাকিস্তান আমলেই দুইবার পরিবর্তন করা হয়েছিল। প্রথমে ১৯৫০ সালে ৩৩.৩ একর (১০০ বিঘা) নির্ধারণ করা হয়েছিল । পরবর্তীতে ১৯৬১ সালে আইয়ুব খানের শাসনামলে এই সীমা ১২৫ একর (৩৭৫ বিঘা) নির্ধারণ করা হয়। স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালে ভূমি সংস্কার কর্মসূচী গৃহীত হলে ১৯৫০ সালের মালিকানার সীমা পুনরায় কার্যকর করা হয়। ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশে কৃষি জমির সর্বোচ্চ সীমা ৬০ বিঘা নির্ধারণ করা হয়েছিল। এই অধ্যাদেশ অনুসারে, একজন ইজারাদার বা কোন পরিবার বা সংস্থা কৃষি ও অকৃষি মিলে সর্বোচ্চ ১০০ বিঘা জমি মালিকানায় রাখতে পারবে, যেখানে এই ১০০ বিঘার মধ্যে সর্বোচ্চ ৬০ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির মালিকানা থাকতে পারবে। তবে এই জমির মালিকানার সীমা কেবলমাত্র সাধারণ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে, সরকার এই উল্লিখিত এই সীমা (যেমন কোম্পানি, সমবায় সমিতি, কৃষি খামার ইত্যাদির জন্য) শিথিল করতে পারে।

বাংলাদেশে, সামাজিক জীবনে সংঘর্ষ ও সংঘাতের অন্যতম প্রধান কারণ জমি

সংক্রান্ত বিরোধ। ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ প্রায়শই সহিংসতায় রূপ নেয়, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়, যা সামাজিক সম্প্রীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। দেখা যায়, আনুমানিক ৮০ শতাংশ আদালতের মামলা জমির মালিকানা বিরোধের সাথে সম্পর্কিত, যা সমস্যার তীব্রতাকে নির্দেশ করে। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে দেখা যায় দেশে ৩২ লক্ষ ভূমি সংক্রান্ত বিচারাধীন মামলা কোর্টে ঝুলে আছে। এই মামলা বা বিরোধগুলি সমাধান করতে ১৫ থেকে ৬০ বছর সময় লাগতে পারে। ভূমি সংক্রান্ত বিরোধের উল্লেখযোগ্য কারণগুলির মধ্যে রয়েছে অযোগ্য পরিবারগুলিকে খাস জমি বণ্টন, অযোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত জমি দখল এবং রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী ব্যক্তিদের দ্বারা সরকারি ও বেসরকারি জমি দখল। জমি সংক্রান্ত বিরোধগুলি সমাধান করতে যেহেতু দীর্ঘ বছর লাগে, ফলে ধনী ব্যক্তিরা ছাড়া সকলের জন্য আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের জমির অধিকারে নেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রেই, বিচার বিভাগের সদস্য , পুলিশ , ম্যাজিস্ট্রেট এবং সরকারি কর্মকর্তাদের একাংশের অনৈতিক আচরণের কারনে জমি দখলকারী সিন্ডিকেট তাদের অবৈধ কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে পারে। ভূমি দখল নিয়ন্ত্রণ এবং জমির উন্নত ব্যবস্থাপনার জন্য, কর্তৃপক্ষের উচিত এই আইনগুলি কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা এবং একই সাথে অতিরিক্ত জমি সরকারের কাছে সমর্পণ করার জন্য শক্তিশালী ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

দেশে ক্রমাগত ভূমি/কৃষি জমি হ্রাস পাচ্ছে (পরিমাণগত ও গুনগত দিক থেকে) ভূমির মালিকানার পাশাপাশি ভূমির ক্রমাগত হ্রাস পাওয়া ও একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা।

ভূমি কমে যাওয়ার ক্ষেত্রে দুটি দিক গুরুত্বপূর্ণ ; পরিমাণগত ও গুনগত দিক। মানুষ সৃষ্ট কার্যকলাপ এবং পরিবেশগত চাপের সংমিশ্রণের কারণে জমির গুণমান এবং পরিমাণ উভয় ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য অবনতি হচ্ছে। সরকারী হিসাবে বাংলাদেশে, প্রতি বছর ২,৫০০ থেকে ৩,০০০ হেক্টর আবাদযোগ্য জমি অকৃষি খাতে রূপান্তরিত হয়, যার ফলে কৃষির জন্য প্রাপ্য জমির পরিমাণ আরও হ্রাস পাচ্ছে

। ২০২০ সালের এক গবেষণায় দেখা যায় ১৯৭৬ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে, প্রায় ১৩,৪১২ হেক্টর কৃষি জমি হারিয়ে গেছে। অন্যদিকে, পরবর্তী সময়ে ২০০০ থেকে ২০১০ – ১০ বছর – ৩০,০০০ হেক্টরেরও বেশি জমি হারিয়ে গেছে।

১. প্রতি বছর, অপরিকল্পিত নগর সম্প্রসারণ বিশেষ করে ছোট শহর এবং আধা-নগর এলাকায় রাস্তাঘাট এবং শিল্প উন্নয়নের মতো অকৃষি কাজে চাষযোগ্য জমির ব্যবহারের ফলে বার্ষিক প্রায় ১% কৃষি জমি হারিয়ে যায়।
২. মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (SRDI)-এর সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে যে বাংলাদেশের ৭৬.২ শতাংশ জমি মাঝারি থেকে অত্যন্ত তীব্র মাত্রার অবক্ষয়ের শিকার বা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই গবেষণাপত্রে আরও বলা হয় প্রতি বছর প্রায় ঢাকা শহরের আয়তনের সমান (২৭০ বর্গকিলোমিটার) জমির উর্বরতা হারাচ্ছে। প্রতি বছর উদ্বেগজনকভাবে জমি নষ্ট হওয়ার হার বাড়ছে।
৩. ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাসায়নিক সারের অধিক ব্যবহারের ফলে স্বল্পমেয়াদে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করছে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের ফলে মাটিতে পুষ্টির ভারসাম্যহীনতা তৈরি হচ্ছে এবং মাটির স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছে। অনেক মাটিতে উর্বরতার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ২% -এর নিচে জৈব পদার্থের পরিমাণ নেমে গেছে (সয়েল ফাউন্ডেশন, ২০২৩)
৪. উপকূলীয় অঞ্চলে, জলবায়ু পরিবর্তন এবং চিংড়ি চাষের কারণে লবণাক্ততার মাত্রা বৃদ্ধি মাটিতে লবণের প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে আরও ব্যাহত করেছে, যার ফলে এটি বেশিরভাগ ফসল উৎপাদনের জন্য অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে।
৫. ইট ভাটায় প্রতিদিন আনুমানিক আট লক্ষ টন মাটির উপরিভাগ (top soil) অপসারণ করে, যা সরাসরি চাষের জন্য উপলব্ধ জমিকে হ্রাস করে এবং মাটির গুণমানকে আরও নষ্ট করে
৬. কারখানা থেকে শিল্প দূষণ, বন উজাড় এবং ইলেকট্রনিক ও চিকিৎসা বর্জ্যের অনুপযুক্ত নিষ্কাশন মাটির মানকে আরও নষ্ট করার জন্য অন্যতম দায়ী ।
৭. বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ১০,০০০ হেক্টর জমি নদী ভাঙনের শিকার হয় ; পরিবেশ ও ভৌগোলিক তথ্য পরিষেবা কেন্দ্র (CEGIS) অনুসারে গত ২২ বছরে (২০০০-২০২২ সাল), পদ্মা এবং যমুনা নদীতে ৫০,৯৫৫ হেক্টর জমি নদী ভাঙনের শিকার

হয়েছে
৮. প্রতি বছর সমাজের ধনী শ্রেণীর এক অংশ কৃষি জমি নষ্ট বা দখল করে রিসোর্ট, বিনোদন কেন্দ্র, আবাসিক প্লট তৈরি করছে যাতে কৃষি জমির উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এই প্রবণতাসমূহ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ এবং গ্রামীণ জীবিকার জন্য একটি গুরুতর হুমকি।

খাস জমি সংক্রান্ত আইনি কাঠামোর বিবর্তন এবং ভূমিহীনদের বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ

দেশের ভূমি সংক্রান্ত আইনি কাঠামো ও ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক সময়ে তৈরি করা আইনের কাঠামোর সাথে গভীরভাবে প্রোথিত যার ধারাবাহিকতা সমসাময়িক সময়েও দেখা যায়। খাস জমির বিষয়টি অত্যন্ত অবহেলিত এবং অস্বচ্ছ। এমনকি সরকারী সূত্রগুলিও স্বীকার করে যে খাস জমির পরিমাণ সঠিকভাবে কেউই জানে না এবং এর বন্টন এবং প্রভাব সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণার অভাব রয়েছে।

বাংলাদেশে খাস জমি (সরকারি মালিকানাধীন জমি) নিয়ন্ত্রণের আইনি কাঠামো ব্রিটিশ আমল থেকে একাধিক আইন, বিধি এবং নীতিমালার মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে ১৮৬৮ সালের বঙ্গীয় পলিমাটি আইন: রাষ্ট্রীয় জমি এবং নদীভাঙন সম্পর্কিত প্রাথমিক ঔপনিবেশিক বিধিমালা। এরপর রয়েছে বেঙ্গল ক্রাউন এস্টেট ম্যানুয়াল (১৯৩২): সরকারি জমি পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক নির্দেশিকা। ১৭৯৩ সালে ব্রিটিশদের দ্বারা প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর পূর্ববঙ্গ জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি কাঠামো যাতে জমিদারি ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হয়। এই আইনটি বিল আকারে প্রথমে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্বে
উত্থাপিত হয়। পরে পাকিস্তান শাসনামলে এই আইনটি কার্যকর হয়। পূর্ববঙ্গ জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ : জমিদারি ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে এবং বিধান রাখা হয় যে কৃষি জমি সরাসরি কৃষকদের (মালিক বা রায়ত) মালিকানাধীন থাকবে সেখানে রায়ত/কৃষক এবং রাষ্ট্রের মধ্যে কোনও মধ্যস্থতাকারী থাকবে

না। এই আইন পরবর্তী খাস জমি নীতি তৈরিতে প্রধান আইনি ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। স্বাধীন বাংলাদেশের ভূমি সংক্রান্ত আইন ‘বাংলাদেশ জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (চতুর্থ সংশোধন) আদেশ, ১৯৭২ এবং বাংলাদেশ ভূমিধারণ সীমা আদেশ, ১৯৭২ : জমির মালিকানার উপর সীমা প্রবর্তন এবং খাস জমির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরও স্পষ্ট করে। ভূমি সংস্কার কর্মসূচী, ১৯৮৭ এবং কৃষি খাস ভূমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতি, ১৯৯৭: ভূমিহীন পরিবার এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিয়ে খাস জমি চিহ্নিতকরণ, ব্যবস্থাপনা এবং বিতরণের পদ্ধতি বিবৃত হয়েছে।
নদী ভাঙনের ফলে একদিকে যেমন প্রতি বছর জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় তেমনি কিছু জমি পুনরায় জেগে উঠে তাই , বাংলাদেশের আইনে এই জমি বিলীন হয়ে যাওয়া বা পুনরায় জেগে উঠাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের আইনে “নদী সিকস্তি বলতে সাধারণত নদীভাঙনের ফলে জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া এবং পরবর্তীতে সেই জমি পুনরায় জেগে ওঠার বিষয়কে পয়স্তি বোঝানো হয়। এটি ভূমি মালিকানা ও ব্যবহার সংক্রান্ত এক গুরুত্বপূর্ণ আইনগত বিষয়। ১৮২৫ সালের বেঙ্গল এলুভিয়ন ও ডিলুভিয়ন রেগুলেশন আইনে নদী সিকস্তি ও পয়স্তিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যদি কোনো জমি নদীর ভাঙনে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়, সেটিকে সিকস্তি বলা হয়। আবার, বিলীন হওয়া জমি পুনরায় জেগে উঠলে সেটিকে পয়স্তি বলা হয়। ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনে বলা হয়

১. নদীভাঙনে বিলীন জমি ৩০ বছরের মধ্যে পুনরায় জেগে উঠলে, পুরাতন মালিক বা তার উত্তরাধিকারী জমির মালিকানা ফেরত পেতে পারেন, যদি তার মোট জমি ৬০ বিঘার বেশি না হয়।
২. ৬০ বিঘার বেশি জমি থাকলে, শুধুমাত্র ৬০ বিঘা পর্যন্ত ফেরত পাবেন; অতিরিক্ত অংশ সরকারী খাস জমি হিসেবে গণ্য হবে।
৩. জমি ফেরত পেতে মালিককে কোনো সেলামী দিতে হয় না, তবে ভূমি উন্নয়ন কর দিতে হবে।
৪. নদীগর্ভে বিলীন জমি জেগে উঠলে, প্রমাণস্বরূপ রাজস্ব অফিসার কর্তৃক খাজনা মওকুফের রশিদ সংরক্ষণ করতে হবে

৫. ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ অনুযায়ী, নদীগর্ভে বিলীন জমি পুনরায় জেগে উঠলে সেটি সরকারী খাস জমি হিসেবে গণ্য হবে এবং ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।
৬. তবে, বিতরণের ক্ষেত্রে পূর্বের মালিককে অগ্রাধিকার দেয়া হয়, যদি তার জমির পরিমাণ নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকে

১৯৯৪ সালের সংশোধনী অনুযায়ী, নদীভাঙনে বিলীন জমি ৩০ বছরের মধ্যে জেগে উঠলে পূর্বের মালিক জমি ফেরত পাবেন, তবে সর্বোচ্চ ৬০ বিঘা পর্যন্ত জমি ফেরত পেতে হলে নির্ধারিত ফরমে ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফের জন্য আবেদন করতে হবে।

প্রাচীনকাল থেকে জমি সংক্রান্ত আইন খুব বেশি কিছু পরিবর্তন হয়নি, কেবল রাজা বা তার প্রতিনিধিদের উৎপাদিত ফসলের অংশ প্রদান এবং কৃষকদের বিদ্যমান সম্পত্তির ক্ষতি না করে অন্যদের কাছে অব্যবহৃত জমি বণ্টনের অধিকার বাদে। ব্রিটিশ আমলে সরকার খাস জমি অন্যদের কাছে নির্দিষ্ট রাজস্বের ভিত্তিতে ইজারা দিতে পারত। এই ধরনের জমির ইজারাদাররা নিজেরাই চাষাবাদ করতে পারত অথবা বর্গাদারদের (ভাগাভাগিদারদের) মাধ্যমে জমি চাষ করতে পারত যাদের উৎপাদিত ফসলের অর্ধেকের বেশি জমির উপর কোন অধিকার ছিল না।

বাংলাদেশে ২ ধরণের খাস জমি রয়েছে কৃষি খাস জমি ও অকৃষি খাস জমি। বাংলাদেশের ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ অনুসারে দেশের মোট খাস জমির পরিমাণ আনুমানিক ৪০ লক্ষ একর – এর মধ্যে মোট কৃষি খাস জমির পরিমাণ ১৭.৫ লক্ষ একর এবং অকৃষি খাস জমি রয়েছে ২২.২ লক্ষ একর। তবে সারা দেশে ইজারাযোগ্য বা বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাস জমির পরিমাণ ৫ লক্ষ একরেরও বেশি এবং অকৃষি খাস জমির পরিমাণ ১ লক্ষ একরের বেশী। তবে কিছু গবেষণায় অনুমান করা হয়েছে প্রকৃত খাস জমির পরিমাণ ৫০ লক্ষ একরের কাছাকাছি হতে পারে কারন এর মধ্যে খাস জমির একটা অংশ রেকর্ডবিহীন এবং অপ্রকাশিত। বার্ষিক

প্রতিবেদন ২০২২-২৩ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীমতিালা, ১৯৯৭ অনুসারে ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ পর্যন্ত ৫ লক্ষ ৪০ হাজার ভূমিহীন পরিবারকে ১ লক্ষ ৫৪ হাজার একরের বেশী খাস জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

অপরদিকে অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীমতিালা, ১৯৯৫ এর আওতায় অর্থনৈতিক অঞ্চল , সরকারী দপ্তর, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৭৬৩.৮৩৪ একর অকৃষি খাস জমি প্রদান করা হয়েছে। সরকারি তথ্য অনুসারে, প্রায় ৩২.৩% খাস জমি এবং জলাশয় বন্দোবস্ত করা হয়েছে (সুবিধাভোগীদের মধ্যে বরাদ্দ করা হয়েছে)। তবে, স্বাধীন গবেষকরা অনুমান করেন যে বন্দোবস্তের হার মাত্র ২৩.৮% কার্যকর হয়েছে। বিশেষ করে কৃষি খাস জমির ক্ষেত্রে, সরকারী দাবি অনুসারে, ৪৪% বিতরণ করা হয়েছে, তবে স্বাধীন বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে মাত্র ২৬% প্রকৃতপক্ষে ভূমিহীন সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছেছে। এর মধ্যে, মাত্র ১১.৫% কার্যকরভাবে দরিদ্রদের হাতে রয়ে গেছে, কারণ স্থানীয় অভিজাত এবং অবৈধ দখলদারদের চাপের কারণে বেশিরভাগ প্রাপক তাদের জমি ধরে রাখতে পারছেন না।

খাস জমি পাওয়া এবং প্রাপ্ত জমি অধিকারে রাখা উভয়ই ভূমিহীনদের জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জ । খাস জমি প্রাপ্তি এবং ধরে রাখার ক্ষেত্রে ভূমিহীনদের বিভিন্ন কাঠামোগত বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এর মধ্যে রয়েছে দুর্নীতি, আইনি বিভ্রান্তি, প্রভাবশালী ভূমি দখলকারী এবং দুর্বল প্রশাসনিক সহায়তা। অনেক গ্রহীতাকে ঘুষ প্রদান, মামলা মোকদ্দমা সহ্য করা বা স্থানীয় ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের হুমকির সম্মুখীন হতে হয়। পুরুষতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধ এবং বৈষম্যমূলক নীতির কারণে নারীরা অতিরিক্ত বাধার সম্মুখীন হন। এক জরিপে দেখা যায় যে ২০২০ সালে যে সকল ভূমিহীন পরিবার খাস জমি পেয়েছিল তাদের ৮৫ শতাংশ পরিবারের ইতিবাচক পরিবর্তনের কথা জানিয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে উন্নত খাদ্য নিরাপত্তা, আবাসন এবং সঞ্চয়। পরিবারগুলি সামাজিক স্বীকৃতিও অর্জন

করেছে এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা বৃদ্ধি করেছে। তবে, অমীমাংসিত বিরোধ বা আর্থিক চ্যালেঞ্জের কারণে কেউ কেউ তাদের জমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন, যা থেকে বোঝা যায় যে কেবল জমি থাকলেই সাফল্যের মুখ দেখা যায়না। যদি একে সহায়ক পরিষেবার সাথে যুক্ত করা যায় তবেই সাফল্য আসে।

সুপারিশসমূহ

আমরা একটি সমন্বিত ও জনবান্ধব কৃষি ও ভূমি সংস্কারের জন্য একটি কমিশন গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করার আহবান জানাচ্ছি । তবে এই উপস্থাপিত প্রস্তাবনায় কৃষিতে জমির গুরুত্বকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে কারন তা খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ এবং গ্রামীণ জীবিকার সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে সরকার ভূমি সম্পর্কিত অনেক আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে কিন্তু আইন, নিয়ম ও নীতিমালা জটিল এবং দরিদ্র-বান্ধব নয়। বাংলাদেশ সরকার জমির মালিকানার উপর ঊর্ধ্বসীমা আরোপ করেছে যাতে জমির মালিকানা ভূমিহীনদের মধ্যে অথবা যাদের জমির পরিমাণ কম তাদের মধ্যে পুনর্বণ্টন করা যায় এবং অবশিষ্ট খাস জমি ভূমিহীন ও দরিদ্র পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা যায়। একটি ডিজিটাল ও আপডেটেড সিস্টেমের অভাবে সেই প্রচেষ্টা সফল হতে পারেনি। তাই ভূমি ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাল ও আপডেটেড করা প্রয়োজন।
২. ভূমি প্রশাসন ম্যনুয়াল ১৯৮৭ এবং কৃষি খাস ভূমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতি, ১৯৯৭: ভূমিহীন পরিবার এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে খাস জমি চিহ্নিতকরণ, পরিচালনা এবং বিতরণের জন্য রূপরেখা দিয়েছে , তবে তা যেন অনুসরণ করা হয় তা সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে
৩. ১৯৯৭ সালের খাস ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতি সংশোধন করে যে বিধানগুলি বৈষম্যমূলক তা অপসারণ করতে হবে বিশেষভাবে যেখানে বলা হয়েছে বিধবা এবং স্বামী পরিত্যক্তা নারীদের খাস জমির জন্য আবেদন করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, যাদের শারীরিকভাবে সক্ষম পুত্র রয়েছে।

৪. মাটিতে পুষ্টির ভারসাম্য এবং মাটির স্বাস্থ্যের সুরক্ষার জন্য কর্পোরেট কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থার পরিবর্তে পারিবারিক কৃষিকাজ এবং জলবায়ু সহনশীল টেকসই কৃষিকাজকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে
৫, পরিবেশসম্মত ও প্রকৃতি বান্ধব কৃষিকে (agroecology) গুরুত্ব দিতে হবে যা একদিকে খাদ্য সার্বভৌমত্ব ও অন্যদিকে পরিবেশগত ভারসাম্য এবং মাটির পুষ্টি ও গুণমান রক্ষায় অবদান রাখবে
৬. টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা, অকৃষি ভূমি রূপান্তর নিয়ন্ত্রণ এবং এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মাটির স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিতে হবে
৭. খাস জমি বন্টন সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য, জমির পরিমাণ, যোগ্যতা, পদ্ধতি এবং গ্রহীতা তালিকা – সংবাদপত্রে এবং স্থানীয় সম্প্রচারের মাধ্যমে সর্বাধিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে প্রকাশ করতে হবে
৮. খাস ভূমি প্রাপ্ত ভূমিহীন পরিবারকে প্রভাবশালী ব্যক্তি বা স্থানীয় নেতা বা ক্ষমতাবান ব্যক্তি দ্বারা উচ্ছেদ বা হয়রানি থেকে আইনি সুরক্ষা প্রদান করতে হবে।
৯. বিতরণকৃত খাস জমি ভূমিহীন সুবিধাভোগীদের মালিকানায় থাকে এবং অন্যদের দ্বারা দখল করা না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে
১০. খাস জমি বন্টনের ক্ষেত্রে আদিবাসী ভূমিহীন পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্থানিক পরিকল্পনাকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং কৃষক সংগঠনকে স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নে যুক্ত করা
১১. একটি কেন্দ্রীভূত ডাটাবেস তৈরি করে খাস জমির ধরণ, অবস্থান এবং বিতরণের অবস্থাসহ সমস্ত রেকর্ড সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে
১২. খাস জমি সনাক্তকরণ, নির্বাচন, বিতরণ এবং ব্যবহার – সকল পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে দরিদ্র ও ভূমিহীন গোষ্ঠীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে হবে
১৩. বিতরণকৃত খাস জমির উপর চলমান নজরদারি বজায় রাখতে হবে যাতে এর উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার এবং সুবিধাভোগীরা দখল বজায় থাকে

About the Author

Communist party of Bangladesh (Marxist-Leninist)

Ppma_guest_author

View All Posts

Communist party of Bangladesh (Marxist-Leninist)

+ posts